Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৪ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই চৈত্র, ১৪২৮ / 24.03.2022

–: সম্পাদক :–

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

জন্মদিনে বাণী	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
দিব্য বিজয়	শ্রী অরবিন্দ
গীতা পরিক্রমা	ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী
বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
মানুষের মত	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

Shri Bhakti Kumar

জন্মদিনে বাণী **শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ**

(২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ সাল)

আজকের এই শুভ দিনে আমার জীবনে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম ও ধর্মজীবনের পূর্ণতা সাধনে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহায়তাও কামনা করি।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং তাঁর লীলায় সহায়তা করবার জন্য আমরা আগেও যেমন মিলিত হয়েছিলাম, এজন্মেও পুনরায় সম্মিলিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন – কলমির দলের এক জায়গায় টান দিলে চারদিক হ'তে তার লতাপাতার দল জড়ো হয়।

পূর্বে আমাদের সংযোগ ছিল, তাই এজন্মেও আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। বিগত জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর যেটুকু কর্ম অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্মে সেই দিব্য কর্মে পূর্ণতা আনবার জন্যই আবার আমরা মিলিত হয়েছি। এই জন্মেই আমাদের সেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

সকলেই যে ব্যক্তিগত ভাবে সাধন-ভজন করতে পারছেন বা পারবেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা, আলাপন, আদান-প্রদান – এগুলির মাধ্যমে যে শাশ্বত স্পন্দন ও স্ফূরণ ঘটছে, তাতেই আমরা সেই পরমের নিকটবর্তী হচ্ছি অতি সহজে।

আমাদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-ব্যথার যতই সঙ্ঘাত আসুক না কেন, তা আমাদের মনকে সাময়িক ভাবে স্পর্শ করলেও আত্মা প্রাণ ও হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে না। এঁরা পূর্ণভাবেই সর্বদা যুক্ত আছেন তাঁর সাথে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত – যে ভাবেই হোক, তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলেছেন।

আমরা তাঁরই, তিনি আমাদেরই।

জয়তু পার্থসারথি!

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

মাঝে মাঝে আমার জন্য "পার্থসারথি"-র সম্পাদক একটু অসুবিধা ভোগ করেন। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আমার জায়গা হয়েছে শেষ পৃষ্ঠায়। সেই শেষের পাতার লেখাও আমি সময়মত লিখতে পারিনা। তার প্রথম কারণ যাঁকে নিয়ে লিখব তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এত বিস্তৃত ও বিচিত্র, আমি লিখতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি। আবার ভয় হয় কোনটা লিখলে কার বিরাগভাজন হব। আমি যা লিখি তা আমার জীবনের ঘটনা। এর মধ্যে আমার কিছু বানিয়ে লেখবার অবকাশ নেই। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো এত ঠাসা যে কলম ধরলে আমাকে আর চিন্তা করতে হয়না, কলম তার স্বাভাবিক গতিতেই চলে।

এর মধ্যে আমরা Current খবরাখবর পেশ করে নিই। গত ১০ই মার্চ (১৯৮৯) শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল। যাঁরা ছিলেন তাঁর খুব কাছের মানুষ তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছেন আপন আপন তাগিদে, উৎসাহে। মনে আনন্দ হয়েছে আমাদের এত কাছের মানুষ, আপনজন রয়েছেন। মনে জোর এসেছে আমি ও বাপী অসহায় নয়। খুব ভালো লেগেছে। এসেছেন নীরেন দা, শ্রীলা, পারিজাত দা, ইলাদি, আদিত্য দা, মঞ্জুলা দি, স্বপন, মুন্না, ডঃ নলিনী কুণ্ডু, গীতা দি, পথিক, মনু, ভাজন দা, শান্তি দি, শ্রী মজুমদার, খোকন, বাপ্পা, টুবলু, কেউ বাদ যায়নি। এসেছেন আমার ভগ্নীসমা ডঃ কেয়া মুখার্জী ও ডঃ বাসন্তী চ্যাটার্জী। আমার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সঙ্গী অণিমা, আরও আরও অনেকে। গোবিন্দ দা, দীপুও এসেছেন এবং এসেছেন আরও অনেকে। আশ্চর্য হলাম যাঁদের

অনুপস্থিতি দেখে তারা হলেন শ্রী দীপক বসু, পার্থ রায়, দেবীপ্রসাদ বসু। তবু দীপক দা বলেন, "বৌদি, দরকার পড়লেই আমাকে খবর দেবেন, জানতে পারলেই চলে আসব।" তাই তিনি দূরে সরে গেছেন মনে করতে পারছি না।

সুভাষ দা এলেন সকালে অপরাজিতাকে নিয়ে, সে আমার মামণি। শ্রীপ্রীতিকুমার গান শুনতে বড় ভালবাসতেন – মামণি তাঁকে নিজের মনে গান গেয়ে শোনাতে দ্বিধা করে নি। দীপালী বড় ধ্যানস্থ শিল্পী। গান তার জীবন, তার ধ্যান, তার ভাবনা চিন্তায় গান ছাড়া আর কিছু নেই। সে ২৪শে নভেম্বর এসেছিল। মাঝে আরও এসেছে। ১০ই মার্চ সে আসতে পারেনি। বুঝলাম এ অনুপস্থিতি তার অনিচ্ছাকৃত। চিঠি এল রেখার সুদূর পশ্চিম জার্মানী থেকে ঐ দিনই। রেখার নিষ্ঠার কোনও তুলনা খুঁজে পাইনা। আমার জন্মদিনের প্রাক্কালেও তার card এসে পৌঁছায়। আগে রথীন বসুও সস্ত্রীক আসতেন, এখন তার আসাটা কমেছে। জানিনা পার্থসারথির প্রকাশের খরচ বেশ কয়েকবার বাড়বার পর সঙ্কোচবশতঃ আসাটা একটু কমিয়েছেন কিনা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিবিদিষানন্দ বেশ অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটালেন। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন বাড়িতে ভক্ত সাধকের পায়ের ধূলা পড়া ভালো – সত্যি সেদিন আমার গৃহ ধন্য হয়েছিল।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন পালন করাটা আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এ'তো আমার ছেলেমেয়ের বিয়ে নয় যে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া এ বাড়িতে বরাবরই যে কাজকর্ম হয় সেতো যে যার দায়িত্ব নিয়ে করে। এখানে কোন রক্তের সম্পর্ক গড়ে তোলবার প্রয়োজন হয় না। এখানকার সম্পর্ক আত্মিক। সবাই আসেন ভালবাসার তাগিদে, কর্তব্যবোধ থেকে।

এর মধ্যে কিছু element ছিলেন যারা অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষদের মধ্যে ফাঁক খুঁজে কিভাবে বেনোজলের মত ঢুকে যেতেন। কিছুদিন খুব আপন হবার ভান করতেন, নিজের নিজের আখের গুছিয়ে নেবার জন্য অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কগুলোকে exploit করতেন। ঐ ধরণের লোকেদের স্বরূপ জানার পর শ্রীপ্রীতিকুমার তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর একটা বৈশিষ্ট ছিল তিনি যদি মনে করতেন আমাকে ত্যাগ করবেন, আমার মুখের দিকে তাকাতেন না। শ্রীপ্রীতিকুমারের দেহত্যাগের পর এরা পার্থসারথি চক্রের অধিকার নিয়ে নানা

রকমের দুরভিসন্ধিমূলক রটনা শুরু করে। তবে এই ধরণের লোকের সংখ্যা খুবই সীমিত। আর গত আড়াই বছরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি পশুশক্তিকে আপাতভাবে জয়ী মনে হলেও শেষ পর্যন্ত দিব্য শক্তিই অমোঘ অপরাজেয় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমি প্রতিদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করি। এখন আমি একা থাকতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদ আমার উপর আছে। ঘাত প্রতিঘাতের ভয় আর নেই। যা আমি ভোগ করিনি, নিজস্ব বলে জানিনি, তা থাকা আর না থাকা দুইই আমার কাছে সমান। তাই পার্থসারথি চক্র নিয়ে কোনও সমস্যায় আমার বিচলিত হবার সম্ভাবনা নেই। তবে শ্রীপ্রীতিকুমারের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার যদি প্রচেষ্টা হয় সেখানে আমি প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করব। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" – এইটাই আমার কর্তব্য।

– – – – – – – – – –

(** রচনাকাল - মার্চ, ১৯৮৯)

দিব্য বিজয় **শ্রী অরবিন্দ**

(২য় পর্যায়)

দেবতা এবং অসুর প্রকৃতপক্ষে নিকট আত্মীয়, যদিও তারা পরস্পরের থেকে পৃথক। পার্থিব অভিব্যক্তির জন্য ওদের কাউকেই বাদ দেওয়া যেত না। ওদের স্থান একই অস্তিত্বের মধ্যে এবং একই প্রকৃতির দুইটি বিরুদ্ধমুখী মেরুতে। দেবতারা আলো এবং অনন্ত ভগবান থেকে অবতীর্ণ হয়। তারা জগতের লীলাখেলায় তৃপ্ত। অসুরগণ অন্ধকার অস্পষ্টতা থেকে উত্থিত হয়, এবং তারা কোপান্বিত হয় এই প্রচেষ্টায়। দেবতাদের কাজকর্ম নির্ধারিত হয় বিশ্বাত্মা থেকে, এবং তাদের কর্মফল উৎসর্গিত হয় বিশ্বাত্মায়। বিজয়ী দিব্য সঙ্গতি থেকে দেবতাদের জন্ম। দিব্য গুণাবলী যুক্ত থাকে পবিত্রতা এবং সুসঙ্গতির সাথে, স্বভাবতঃই আনন্দময় তারা। দিব্য প্রভাবে বর্ধিত হওয়ার অর্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অধিকারী হওয়া, আলো আনন্দ প্রেমের মধ্যে মধুর আধিপত্য নিয়ে বাস করা; প্রভুত্বের সহিত শাসনাধীনে সেবা করা, সেবার অধীনে শাসন করা, বেগবান

এবং সাহসী হওয়া, এমনি উগ্র প্রচণ্ড হওয়া, অথচ বদমাশ বা হানিকর না হওয়া; নম্র এবং দয়ালু হওয়া, আত্মশিথিলতা থাকা অথচ অসংযমী বা দুর্বল না হওয়া। আপনার মধ্যে উজ্জ্বল আনন্দময় পুর্ণতা স্থাপন করা, সকল মানুষ এবং সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া। পরিশেষে বিশাল নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত করা; বিশ্ব ঐক্যের সমুচ্চ অভিজ্ঞতা লাভ করা। দেবতারা ঐসব দিব্য গুণাবলী সমন্বিত। তারা সকল সময়েই তাদের বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে সচেতন, সুতরাং তারা দিব্য।

দেবত্বের মধ্যে অবশ্যই শক্তি নিহিত আছে। দিব্য মানব হওয়ার অর্থ আত্মশাসক এবং বিশ্বশাসক হওয়া; কিন্তু বাহ্যিক অর্থে নয় নিগূঢ় অর্থে। এই শাসন নির্ভর করে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি এবং একাত্মবোধের উপর যা অপরের জীবনের বিধান কী এবং বিশ্বসত্তার কী বিধান তা জানে এবং সাহায্য করে অথবা, আবশ্যকতানুযায়ী বাধ্য করে তার বৃহত্তম সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে, কিন্তু তা করা হয় দিব্য এবং মূলতঃ আন্তরিক বাধ্যবাধ্যকতার দ্বারা। আমাদের চতুস্পার্শস্থ গুণাবলী শক্তি সমূহ, আনন্দধারা, দু:খের বোঝা, চিন্তারাশি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আশা ভরসা, লক্ষ্য এবং সবই আমাদের মধ্যে গ্রহণ করা, এবং সেই সবকে পরমতম দান প্রতিদানের পন্থায় অধিকতর মূল্যবান এবং রূপান্তরিত করে ফিরিয়ে দেওয়া। দেবগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোর আড়ালে থেকে অথবা ঝড় ঝাপটার মধ্যে থেকে কাজ করে। গোপাল বা কর্মকার রূপে মানুষের মধ্যে বাস করতে তারা অবজ্ঞা করে না। আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিতে বা বাহ্যিক ভাগ্যের বিধানে ক্রুশে বিদ্ধ হতে অথবা কাঁটার মুকুট পরতে তারা ভয়ে সঙ্কুচিত হয় না। কারণ তারা জানে মানুষের অহমিকাকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে হবে। আর সাধারণ মানুষ তাতে সম্মত হবে কেন যদি ভগবান বা দেবতাগণ পথ না দেখায়? মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সারবস্তু আছে তা সমস্ত গ্রহণ করে তাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরে তা'দিকে তুলতে হবে, তখন তারা হবে নিজের এবং অপরের জন্য আলো, আনন্দ, শক্তির উপাদান; উহাই দেবত্ব, উহাই অতিমানবত্বেরও যথার্থ প্রকৃতি।

মানুষের মধ্যে যা কিছু সার পদার্থ আছে সেই সবেরই দিব্য সঙ্গতিপূর্ণ পরমতম অবস্থাই অতিমানবত্ব। মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ভগবানের প্রতিমূর্তিরূপে। দিব্য সত্যের মধ্যে সব কিছুই অসীম, পরম, সঙ্গতিপূর্ণ; কিন্তু মানুষের মধ্যে সবই

হয়ে গেছে সসীম, অসঙ্গতিপূর্ণ, বিকৃত। তথাপি এই অসম্পূর্ণতার মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং আস্পৃহা। সসীম মানুষ হতে চায় অসীম। পরম সত্য আকর্ষণ করে আপেক্ষিক সত্যকে। মানুষের অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন চায় দিব্য সামঞ্জস্য। মানুষ এখন নিম্ন প্রকৃতির দাস, কিন্তু সে জানে প্রকৃতিকে অধিকার করে তার উপর প্রভুত্ব করাই মানবত্ব। মানুষের আস্পৃহাই প্রমাণ করে সে যা হতে চায় তা সে হবেই। মানুষের মধ্যেই বিশ্ব প্রকৃতি তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। মানুষের মধ্যেই পার্থিব প্রকৃতি পশুত্ব থেকে দিব্য আদর্শের দিকে চোখ তুলেছে।

ভগবান জটিলতাময়, তিনি সহজলভ্য নন। মানুষ সহজ পন্থায় তাঁকে পেতে চায়, তাই তাঁর গুণাবলীর একটিকে তারা অবলম্বন করে। জ্ঞান, প্রেম অর্থাৎ আনন্দ, শক্তি, একত্ব –এই সবই ভগবানের দিব্য প্রকৃতির গুণাবলী, কিন্তু ওদের একটিকে মাত্র একান্তভাবে অনুসরণ করলে শেষ পর্যন্ত ভগবান সরেই যান। এমন কি তাঁর একত্বও একান্তভাবে অনুসরণ করলে তা আর একত্ব থাকে না। তথাপি ঐ ভুল আমরা ক্রমাগতই করে চলেছি। আমরা যদি শুধু প্রেমের মন্দিরে উপাসনা করি, তাহলে শক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, এবং জ্ঞানকে অন্যত্র যেতে আদেশ করা হয়। যদি আমরা কেবল শক্তির উপাসনা করি তাহলে প্রেমকে বিদায় দেওয়া হয়। আমরা শুধু জ্ঞানের অনুসরণ করলে আমাদের হৃদয় পদ্ম শুষ্ক হয়ে যায়– সেখানে প্রেমের স্থান থাকে না। আমরা হয়ত শুধু শূন্য ব্রহ্মকেই আমাদের আদর্শ করতে পারি এবং পেতে পারি একরকমের একত্ব যা এনে দেয় না বৃহত্তম জীবন, পরন্তু দেয় চরম মৃত্যু। ঐরূপ ঘটার কারণ আমরা ভগবানের বৃহৎ জটিল রহস্যকে স্বীকার করি না।

প্রেম অপেক্ষা দিব্যতর কিছু হয়ত নাই। কিন্তু একান্তভাবে প্রেমের উপাসনার দ্বারাই জাগতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা যায় না। প্রেম অকৃতকার্য হয় তার কারণ, আনন্দের আতিশয্যে জাগতিক সমস্যাকে প্রেম বর্জন করে, অথবা পদ দলিত করে। শক্তিও জাগতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কারণ বাহ্যিক সমস্যা নিয়েই শক্তি ব্যস্ত থাকে। প্রেমের সাথে থাকা চাই শক্তি এবং জ্ঞান। শক্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করতে হবে আলো ও প্রেমের অধীনতা– তবেই হবে মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ। যখন প্রেমপূর্ণ হৃদয় জ্ঞানের দ্বারা প্রশমিত হয়ে শক্তিসম্পন্ন হবে, যখন শক্তিমানের বাহু দীপ্ত আনন্দ ও

আলোর সাথে জগতের উন্নতি সাধনের কাজে লিপ্ত হবে, যখন জ্ঞানের আলো হৃদয়ের অন্ধ প্রেরণা ও উচ্ছ্বাসকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে দান করবে ঊর্ধস্থ দিব্য সঙ্কল্প, যখন এই সমস্ত দিব্য শক্তি একই সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে সমর্পিত আত্মায় যা সমগ্র বিশ্বের ঐক্যে বাস করে, এবং সব কিছুকে গ্রহণ করে তাদের রূপান্তর সাধনার জন্য। উহাই হোল অতিমানসিক দিব্য পন্থা যা জগতের উন্নতি সাধন করবে। উদ্ধত, শক্তিশালী, আত্মসর্বস্ব সভ্যতা যা নিজেকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানবজাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে তা দিব্য পন্থা নয়।

শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আত্মার দৃষ্টিতে আছে। আত্মা দেখে একটি বস্তু যা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, যা এখনও সাধিত হয় নাই বা যা আমরা এখনও উপলব্ধি করি নাই। আমাদের অন্তরে যে জ্ঞাতা আছেন তিনি সেই বস্তুটিকে সত্যরূপে অনুভব করেন, একান্তভাবে অনুসরণ করার লাভ করার উপযুক্ত মনে করেন, যদিও ঐ বস্তুটির উপস্থিতির বাহ্যিককোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। আমাদের অন্তরস্থ ঐ বস্তুটি সততই বিরাজ করেন, যদিও আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন স্থির বিশ্বাস থাকে না, এমনকি আমাদের প্রাণসত্তাও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তাঁকে অস্বীকার করে। যোগ সাধনায় রত এমন সাধক কে আছে যাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য হতাশা, অকৃতকার্যতা, অবিশ্বাস এবং অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকতে না হয়েছে? কিন্তু এমন একটা কিছু আছে যা সাধককে অবলম্বন দেয়, এমন কি তার মনের অবিশ্বাস সত্বেও তাকে যোগের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়, কারণ এই অন্তরস্থ বস্তুটি বোধ করে এবং নিশ্চিতরূপে জানে যে সে যার অনুগামী হয়েছে তা সত্য। যোগ সাধনায় সর্ব প্রধান বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আত্মার মধ্যে আছে স্বাভাবিক ভাবেই। আত্মা জানে যে ভগবান আছেন, এবং একান্তভাবে তাঁরই অনুগামী আমাদিগকে হতে হবে। এ জীবনে আর কিছুই তাঁর অপেক্ষা অধিক কাম্য নয়। আত্মস্থ ঐরূপ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে যে মানুষ সচেতন সে-ই আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এবং যদিও তার বাহ্য প্রকৃতি বাধা বিঘ্নে পূর্ণ থাকে, ভগবানকে অস্বীকার করে এবং সঙ্কটের সৃষ্টি করে। যদিও তাকে বহু বহু বৎসর যাবৎ প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা করতে হয়, তথাপি সে আধ্যাত্মিক জীবনে কৃতকার্য হবেই।

বিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি, প্রেরণা, প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে আলোকের অলঙ্ঘনীয় আবাহনে সাড়া দিতে হবে। অবিশ্বাস, অবসাদ যখন আসে তখন

বলতে হয় –"আমি ভগবানের, আমার পতন নাই।" যখন মনে হবে তুমি অক্ষম, তুমি অপবিত্র তখন বলবে –"অমৃতের সন্তান আমি, ভগবান আমাকে গ্রহণ করেছেন। আমার নিজের উপর, ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখলেই হয়– বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমার যদি পতন হয়, তাহলেও আবার আমি উঠবো।" অন্য কোন ক্ষুদ্রতর আদর্শের আকর্ষণ এলে বলতে হয় –"যে আদর্শ আমি গ্রহণ করেছি তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র ইহাই পারে আমার অন্তরের আত্মাকে তৃপ্তি দিতে। আমি সর্বরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হব, সকল বাধাবিপত্তি জয় করে এই দিব্য যাত্রার পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবো।"

সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রদ্ধাবিশ্বাস থাকা আবশ্যক। আমরা অজ্ঞান, আমরা এখনও জানিনা কী আমরা উপলব্ধি করতে চাই। বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই যা অজ্ঞানতাকে নিজের সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দিয়ে দেয়, অনুদিত সূর্য যেমন পূর্বাভাস দেয়। সূর্য যখন উদিত হয় তখন আর আভাসের প্রয়োজন হয় না। অতিমানসিক জ্ঞান স্বপ্রতিষ্ঠিত। তাকে প্রমাণ করবার জন্য কোন বিশ্বাসের আবশ্যকতা নাই। অতি মানসিক অভিব্যক্তি হবে জ্ঞানের মাধ্যমে, অজ্ঞানতায় নয়। জ্ঞানের আলোতে আমরা অগ্রসর হব বিশালতর পূর্ণতর জ্ঞানের অভিমুখে।

মন ও প্রাণকে সত্যপূর্ণ কর, এবং স্থির ও শান্ত হয়ে থাকো। অতৃপ্ত বাসনাই সকল দুঃখ কষ্টের মূল। বাসনাশূন্য শান্তির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। তারপরই আসতে পারে দিব্য সত্য, প্রেম এবং আনন্দ।

পার্থিব জীবনকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পার্থিব জীবনের রূপান্তর আবশ্যক। সমগ্র জীবনই অতিমানসিক আধ্যাত্মিক সত্তার অংশ, একটি গঠন এবং প্রকাশের উপযুক্ত আধার। উহাই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির শিখর এবং সর্ব্বোচ্চ পরিণতি।

* * * (শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে) * * *

১।। "গীতা গঙ্গা হিন্দুর হিন্দুয়ানি" কথাটি লিখেছেন পরিব্রাজক গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ। গীতা-গঙ্গা সম্বন্ধে ব্যাসদেব মহাভারতে আরও ব্যাপক ও গম্ভীর করে লিখেছেন ভীষ্মপর্বে-

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গৌবিন্দেতি হৃদিস্থিতে।
চতুর্গকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

এখানে গীতা-গঙ্গার সঙ্গে গায়ত্রী ও গোবিন্দ যুক্ত হয়েছেন। আর ফল- মোক্ষ লাভ- পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। স্বামীজীর ও ব্যাসদেবের দুটি উক্তির মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। মহাভারতের যুগে হিন্দু নামে কোন কথা বা ধর্ম ও সম্প্রদায় ছিল না। মহাভারতের মোটামুটি হাজার দুই বৎসর পরে সিন্ধুনদের তীরস্থ অধিবাসিগণকে গ্রীক যাবণিক ভাষায় হিন্দু বলা হয়েছিল। তা থেকে ওই অঞ্চলের তথা ভারতবর্ষের নাম হিন্দ্ বা হিন্দুস্থান আর ভারতবর্ষের লোকজনকে এবং তাদের ধর্মকে হিন্দু নামে চিহ্নিত করেছিল বিদেশীরা। সে যুগে বিভিন্ন কুল, দেশ, ভাষা অনুসারে চিহ্নিত মানুষের মধ্যে আচার-আচরণে বিপুল পার্থক্য ছিল এবং দেশ- নামে তাদের পরিচয় ছিল স্বতন্ত্র। জীবনাদর্শও সর্বত্র বেদ শাসিত ছিল না। তবে সাধারণ ভাবে চতুরাশ্রম ও চতুবর্গের আদর্শ গৃহীত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।কাজেই তখন সকলের নিকটই সাধারণ ভাবে শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ছিল পুনর্জন্ম নাশ বা মোক্ষ লাভ। আর এ আদর্শটি একান্ত ভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং সাধারণ মানুষের কাছে পরমাদর্শ নামে সমাদৃত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম অর্বাচীন প্রয়োগ - প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম, মানব ধর্ম।

২।। ভারত বৈদিক বা বেদাশ্রিত। খুব সংকীর্ণার্থে বেদ বলতে বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থকে বুঝায় বটে কিন্তু ব্যাপকার্থে বেদ বলতে বুঝি নিখিল জ্ঞানরাশি। যে জ্ঞান মানুষ অর্জন করেছে-নিয়ত করছে ও করবে – সব কিছুই বেদ। কোন বিশেষ ব্যক্তির বা স্থানের কি কালের অধিকার দ্বারা তা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ নয়। এই অর্থেই বোধহয় বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়। শুধু অপৌরুষেয় নয় - অসীম, অনন্ত, নিত্য ও সনাতন। সংহতার্থে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে বেদ এবং বেদাঙ্গাদি সমন্বিত হয়ে বৈদিক সাহিত্য। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের প্রৌঢ়ি অর্থাৎ উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবনার অন্ত্যসীমা। গীতা গ্রন্থের

অন্যতম পরিচয় তা উপনিষদের সার। সমগ্র উপনিষদ গোধন দোহন করে গীতা রূপ দুগ্ধ আহরণ করেছেন গোপালনন্দন শ্রীভগবান। এ দোহন কর্মের বৎস হলেন অর্জুন আর সমাহৃত অমৃতোপম গীতা দুগ্ধের ভোক্তা হলেন সুধীমণ্ডলী। অর্জুন উপলক্ষ- লক্ষ্য জিজ্ঞাসু বিশ্ববিবেক।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

কিন্তু মুখ্য হলেও কেবল ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানই গীতার একমাত্র বিষয় নয়, গীতার মধ্যে মানব জীবনের যাবতীয় প্রধান জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর বিদ্যমান। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। তার উৎসস্থলের ও অধিকার সীমার গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব নিরূপম করেছেন মহাভারতের টীকাকার নীলকন্ঠ পুরী। বলেছেন- মহাভারতের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে বেদের সারবস্তু আর গীতার মধ্যে আছে মহাভারতের মর্মার্থ। তাই গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী।

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃতস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা।।

কোন মনুষ্য বিশেষ সৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের মূল তত্ব কী-তা জানতে হলে উক্ত প্রবর্তকের বাণী সমন্বিত গ্রন্থখানি অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের উক্তি সমূহ বা ত্রিপিটক বা খ্রীষ্টকথা বাইবেল বা হজরত মহম্মদের উপদেশ সমুচয় কোরাণ শরিফ প্রমুখ গ্রন্থসমূহ পাঠ করলেই সে সব তত্ব জানা যায়। কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্মের এমন কোন একখানি গ্রন্থ নেই, শাস্ত্রও অসংখ্য এবং বিচিত্র। প্রবক্তা বা ঋষিও অনেক। সে ক্ষেত্রে সর্ব উপনিষদের সার এবং সর্বশাস্ত্রময়ী ভগবদ্ গীতাই সনাতন ভারতের জীবনদর্শনের একমাত্র সার্থক প্রতিনিধি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে সব মনীষী গীতা পাঠ করেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, কেবল গীতা পাঠ দ্বারাই সব কিছু জানা যায়। মহাভারতের ব্যাস বাক্যটি উল্লেখ করা যাক। অন্যান্য বহু শাস্ত্র পড়ে লাভ নেই, একমাত্র গীতা ভাল করে পাঠ করবে। পদ্মনাভ বিষ্ণুর মুখ থেকে নিঃসৃত গীতা যেন গঙ্গা ধারা।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা।।

এ মত সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। পরম শৈব মহাযোগী গম্ভীরনাথজী বলেছেন- "এক গীতা বহুৎ।" প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের গীতা গঙ্গা শব্দ দুটির তাৎপর্য

অনুধ্যান করা যাক। বিষ্ণুর মুখপদ্ম থেকে বেরিয়েছে গীতা আর গঙ্গা নির্গত হয়েছে বিষ্ণু পাদপদ্ম থেকে। বিষ্ণু সর্ব ব্যাপক স্থিতি বা পালন শক্তির আধার।

৩।। পরিক্রমা কথাটি এসেছে 'ক্রম' ধাতু থেকে যার অর্থ আনন্দে পায়ে হেঁটে চলা। পরি উপসর্গটির ব্যঞ্জনা হচ্ছে ব্যাপক ভাবে, চতুর্দিক থেকে অর্থাৎ সর্বতোভাবে। তা হলে পরিক্রমার মানে হল-উপর উপর ভাসা ভাসা কিয়ৎ দর্শন নয়, খুব ভাল করে প্রদক্ষিণ, চারদিক দেখে শুনে চলা। তীর্থ পরিক্রমার বিধান আছে শাস্ত্রে। তীর্থ হচ্ছে পুণ্য স্থান, পবিত্র স্থিতি-যা মানুষের উত্তরণ ঘটায়। ত্রিবিধ তীর্থ- স্থাবর, জঙ্গম আর মানস। কাশী কাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র আদি স্থাবর তীর্থ বহু মুনি ঋষি পাঠকের তপঃ প্রভাব পুষ্ট পুণ্য স্থান। জঙ্গম তীর্থ বা চলমান তীর্থ হচ্ছেন-ব্রাহ্মণ মুনি ঋষি সাধু সন্তগণ। তাঁদের সঙ্গ ও মুখের বাণী শুনে – তাতে স্নান করলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্মলং সর্বকামিকম্।
যেষাং বাক্যোদকে নৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ।।

আর আছে মানসতীর্থ। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম, দয়া, সরলতা, দান, দম, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি মানস সম্পদ।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্বভূত দয়া তীর্থং সর্বত্রার্জব এব চ।।

পবিত্র স্থানে পর্যটন, সাধু মহাত্মার সঙ্গ করা, সদ্ গ্রন্থাদি পাঠ ও সদ্ গুণাদির অনুশীলন সবই তীর্থ পরিক্রমার অন্তর্গত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী চতুরাশ্রমীর পক্ষেই তীর্থ পরিক্রমা ভারতে একটি অবশ্য করণীয় বিধান। সাধুসন্ত ও সদ্‌বাণী মূলতঃ অভেদ। কাজেই গীতাও পরমতীর্থ স্বরূপ। গীতা মাহাত্মে বলা হয়েছে যে যেখানে যেখানে গীতা পাঠ হয়, সেখানে প্রয়াগাদি ভৌম তীর্থ বিরাজ করে।

গীতায়াং পুস্তকং তত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীণি তত্র বৈ।।

অধিকন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে চরম উপদেশ দেবার পর শ্রীভগবান গীতার পঠন-পাঠন-শ্রবণ মহিমা সম্বন্ধে চারটি মন্ত্রে যে কথা বলেছিলেন তাও স্মরণীয়। বলেছিলেন- যে ব্যক্তি সেবা বুদ্ধিতে এই গুহ্য শাস্ত্র ভক্তগণের কাছে পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন। গীতা পাঠক অপেক্ষা প্রিয়তর ব্যক্তি আমার আর নেই, হবেও না। যিনি কৃষ্ণার্জুন সংবাদ রূপ গীতা

পাঠ করবেন তিনি জ্ঞান যোগ দ্বারা আমারই সেবা করবেন আর শ্রদ্ধার সঙ্গে গীতা শুনবেন তিনিও পাপমুক্ত হবেন।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভি ধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।।

[গীতা ১৮/৬৮-৭১]

সুতরাং গীতা পর্যালোচনা ও গীতা তীর্থ পরিক্রমা একার্থক। পরিক্রমা পথে বহিরঙ্গন থেকে দেখে দেখে, প্রদক্ষিণ করে করে, আঠারটি সোপান অতিক্রম করে গর্ভ গুহাতে প্রবেশের সুযোগ বা অধিকার আয়ত্তে চেষ্টা করা যাক। বহিরঙ্গণের আলোচ্য বিষয় কাজেই -গীতার পটভূমি, চরিত্র পরিচয়, স্থান কাল ইত্যাদি বহিরঙ্গ তথ্যগত পর্যালোচনা।

৪।। বহিরঙ্গণে শুধু ভাব নয়, শুধু রূপও নয় - দুটির অন্যোন্যাশ্রয়ে সৃষ্টির উদ্ভব ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আবর্তন কবিতায়-

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

প্রতিটি শিল্পকৃতির এমন কি বস্তু নির্মিতির পেছনেও এক একটি ভাব থাকে, মনোগত কল্পনা বা ধ্যান থাকে- শাখা-প্রশাখা-ফুল ফলে সমৃদ্ধ বৃক্ষের নেপথ্যে সংহত বীজের মতো। ধ্যানের অস্ফুট ভাবরাজি শিল্পীর মায়ায় বিকশিত ও রূপময় হয়ে ওঠে- ধ্যানের ভাব ধ্যেয়কে রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, কাজেই ধ্যান মন্ত্রের একটি নিজস্ব গুরুত্ব আছে। গীতার পাঠক মাত্রেই জানেন যে ভগবদ গীতারও একটি ধ্যানমন্ত্র আছে। নব শ্লোকাত্মক এই ধ্যান মন্ত্রটির মধ্যে গীতার

এবং গীতার বক্তা, শ্রোতা ও লেখকের পরিচয় ও মহিমার বর্ণনা আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই–

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃত বর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িণীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভবদ্বেষিণীম্।।

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধিত করবার জন্য যে কথা বলেছিলেন অর্জুনকে আর প্রাচীন ঋষি বেদব্যাস যা ধরে ফেলেছিলেন মহাভারতের মধ্যে, সেই অদ্বৈত তত্বরূপ অমৃতবর্ষী, সংসার কষ্টনাশিনী, অষ্টাদশ অধ্যায়িনী হে জননী ভগবদ্ গীতা – তোমার অনুধ্যান করি। বাকি আটটি মন্ত্রে এই মন্ত্রটিরই বিস্তার। বক্তা বাসুদেব কৃষ্ণ, শ্রোতা কৌন্তেয় কৃষ্ণ আর লেখক দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ – এই তিন কৃষ্ণের আর ত্রয়ীর সহযোগে সম্ভূত মহৎ গীতামৃতের মহিমাখ্যাপন। এই ধ্যান মন্ত্রের ভাবানুসারে তথ্যাদির বিস্তার এবং যথাস্থানে তত্বাদি বিচার করে করে গীতা তীর্থ পরিক্রমা করা যাক।

৫।। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫ অধ্যায় থেকে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত আঠারটি অধ্যায়ে সাতশত শ্লোক নিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। মহাভারতে এই অংশের নাম ভগবদ্ গীতা পর্বাধ্যায়। এই ভগবদ গীতা পর্বাধ্যায়টি ব্যাসদেব মহাভারত রচনার সমকালে একই সঙ্গে রচনা করেছিলেন, না – পরে অন্য কোন ব্যাস এটি লিখে সংযোজিত করেছেন– অর্থাৎ এটি প্রক্ষিপ্ত কিনা– তা নিয়ে তর্ক আছে। এই সংশয়ের মুখ্য হেতু গীতার উপস্থাপনার বিচিত্র ক্ষেত্র ও কালটি। যুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্ মুহূর্তে সৈন্যরা সমাগত ও প্রস্তুত, অর্জুনও ধনু উত্তোলন করে তীরক্ষেপ করতে উদ্যত –[প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ (১/২০)] এমন সময় অর্জুনের ইচ্ছে হল দু পক্ষের যোদ্ধাদের একবার দেখে নেবেন। সারথি বাসুদেবকে বললেন মাঝখানে রথটি নিয়ে যেতে। দুপক্ষের যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন– সকলেই আত্মীয়–স্বজন–কুটুম্ব–সুহৃদ। এদের হত্যা করতে হবে? অর্জুনের নির্বেদ এল। তখন অর্জুনকে সবদিক থেকে বুঝিয়ে যে জ্ঞানগর্ভ তত্ব বিস্তার করেছিলেন ভগবান তার নাম গীতা। সংশয়– এমন একটা স্থানে ও কালে কি এমন তত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা সম্ভব? প্রশ্নটি মুখ্যতঃ তুলেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এবং ভারতীয় বিদগ্ধগণ এর উত্তর দিয়েছেন। আচার্য ও মনীষীবৃন্দের সিদ্ধান্ত যে বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নয়, একই সময় ব্যসদেব

ভীষ্মপর্বের অঙ্গ রূপেই ভগবদ্ গীতা পর্বাধ্যায়টি রচনা করেছিলেন। অর্জুনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিশ্লেষণ ছাড়াও - গীতার ভাষা শৈলী, শব্দ প্রয়োগ ও আভ্যন্তরীণ উল্লেখাদি থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন প্রবল। গীতা মহাভারতের সহজাত অঙ্গ।

৬।। গীতার শ্লোক সংখ্যা কত? প্রচলিত গীতা সপ্তশতী অর্থাৎ শ্লোক সংখ্যা সাতশত। আচার্য শঙ্কর থেকে আরম্ভ করে সকল ভাষ্যকারই গীতাকে সপ্তশতী বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষকগণের সন্ধানে গীতার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৪৫ অর্থাৎ কিঞ্চিন্যূন সার্দ্ধ সপ্তশত। এই মতের প্রধান প্রবক্তা স্বয়ং ব্যাসদেব। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ৪৩ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে প্রদত্ত হিসাবটা এই রকম-

ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহকেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্ত পঞ্চশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়;।
ধৃতরাষ্ট্র শ্লোক্কেকং গীতায়াং মানমুচ্যতে।।

অর্থাৎ গীতাতে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন ৬২০ টি শ্লোক, অর্জুনের উক্তি ৫৭ টি, সঞ্জয়ের বাক্য ৬৭ টি আর ধৃতরাষ্ট্রের একটি কথা- সাকুল্যে ৭৪৫ শ্লোক। কিন্তু প্রচলিত সপ্তশতী গীতাতে ভগবদ্ বাক্য ৫৭৫, অর্জুন সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি যথাক্রমে ৮৪, ৪০ এবং একটি, সাকুল্যে ৭০০। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মহাভারত নির্দিষ্ট উক্তির বিচারে প্রচলিত গীতার তুলনায় শ্রীভগবানের উক্তি কম আছে ৪৫টি, পক্ষান্তরে অর্জুনের সঞ্জয়ের উক্তি যথাক্রমে বেশী আছে ২৭টি ও ২৭টি করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল- কাশী, সুরাট, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান থেকে ৭৪৫ শ্লোকী গীতার পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে। মাদ্রাজ ধর্ম মহামণ্ডল থেকে একখানি ৭৪৫ শ্লোকী গীতা গ্রন্থ প্রকাশিতও হয়েছে। মনে হয় শংকর পূর্ব একাধিক ভাষ্যকার ৭৪৫ শ্লোকী গীতার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে পুঁথিগুলি ধ্বংস হয়েছে। আলবেরুনি গীতার শ্লোক সংখ্যা সপ্ত শতাধিক বলেছেন। সম্রাট আকবরের আদেশে আবুল ফজল ও ফৈজী পার্শী ভাষায় গীতার যে অনুবাদ করেছিলেন তার শ্লোক সংখ্যা ৭৪০। মোগল আমলে আরবীতে গীতার যে অনুবাদ হয়েছিল, তার শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫।

৭।। গীতা রচনার কাল নিয়েও মতান্তর আছে। যাঁরা গীতাকে মহাভারতে পরে সংযোজিত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন- তাঁদের মতে গীতা অর্বাচীন গ্রন্থ। বাইবেল রচনার অনেক পরে কোন খ্রীষ্টিয় শতকে এটি রচিত বলে তাঁরা ভাবেন। কিন্তু যাঁরা বলেন গীতা- তথা, গীতা পর্বাধ্যায়টি মহাভারতের সহজাত অংশ ও অঙ্গ তাঁরা মহাভারত রচনার তারিখের সঙ্গে সমন্বিত করেই বিচার করেন। বুদ্ধদেবের তথা বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের অনেক আগেই যে গীতা রচিত হয়েছিল- তার মুখ্য প্রমাণ এই যে গীতা গ্রন্থে ভগবান, তাঁর সমকালে প্রচলিত সকল ধর্মীয় তথা দার্শনিক মত বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু তথাগতের ধর্মমত সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য করেন নি। এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য – "গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন, নবীন কোন মতে নহে। গীতার ভাষা মহাভারতের ভাষা এক। গীতায় যে সব বিশেষণ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই বনাদি পর্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই এবং গীতা যখন তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্রও কেন করেন নাই? বুদ্ধের পরবর্তী যে কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না... পুনশ্চ গীতা সমন্বয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনাদর নাই। সে গ্রন্থাকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রদর্শনের ভার কাহার উপর? উপেক্ষা গীতায় কাহাকেও নাই। ভয়? তাহারও একান্ত অভাব, যে ভগবান বেদ প্রচারক হইয়াও বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগে কুন্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধ মতের আবার কি ভয়?"

[স্বামীজীর বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-৫২]

কিন্তু মহাভারতের রচনার কাল নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। হোলস্ ম্যানের (Haltz Mann) মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক। তবে একটি মত খুব চালু যে একই ব্যাসদেবের লেখনীতে একই সময়ে মহাভারত – যে অষ্টাদশ পর্ব প্রচলিত, সেটি রচিত হয় নি। বীজ সূত্রটি এই-

মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তী কাদি তথা পরে।
তথোপরিচয়াদন্যো বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে।।

তিনটি স্তরে তিন জনের মুখে শোনা গেছে ভারত কথা। দশ সহস্র শ্লোকাত্মক মন্বাদি- যে কথা বলেছিলেন সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদিকে- এটি মহাভারত। সৌতি শুনেছিলেন আস্তিকাদি অর্থাৎ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন কথিত চব্বিশ হাজার শ্লোকাত্মক কাহিনী- এটি ভারত কথা। আর বৈশম্পায়ন শুনেছিলেন উপরিচর্যাদি আট হাজার অষ্টাশি শ্লোকাত্মক কথা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মুখে -এটির নাম জয়। জয়, ভারত, মহাভারত এই তিন পর্যায়ে তিন নামে ভারত কথা উক্ত হয়েছে। তিনটি নয়, একটি কাহিনীরই ক্রমবিকাশ। সব শাস্ত্র পাঠের যে আদি শ্লোকটি ব্যাসদেব রচিত তা জয়াস্য মহাভারতের মঙ্গলাচরণ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

এ নিয়ে দেশে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে। মোটামুটি খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে বর্তমানে প্রচলিত মহাভারতের পরিকাঠামোটি রচিত হয়েছিল। এটি এক বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থ বৈদিক আমলের কাহিনী থেকে শুরু করে সমকালের বিবিধ বিষয় এই "শত সহস্রী" মহাভারতে সংকলিত হয়েছে। হয়ত পরেও হয়েছে। অষ্টাদশ পর্বাত্মক মহাভারতের ক্ষুদ্রতম পর্ব মহাপ্রস্থানিক পর্বের শ্লোক সংখ্যা ১২০টি মাত্র। আর শান্তি পর্বে আছে ১৪৫২৫টি এবং শান্তি ও অনুশাসন পর্ব মিলিয়ে ২১০০০ শ্লোক অর্থাৎ মোটামুটি গোটা মহাভারতের এক চতুর্থাংশের মতো। মহাভারত একাধারে আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র অর্থাৎ একটি মহা মহাকোষ গ্রন্থ। মহাভারত বলেছেন- "যদি হাস্তি তদন্যত্র যৎ নেহাস্তি ন তৎ ক্কচিৎ।" মহাভারতে যা আছে তা সর্বত্র আছে আর মহাভারতে যা নাই, তা কোথাও নাই। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"। যা থেকে ভারতীয় পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র দত্ত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্র্যাটের মতে মহাভারত খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে রচিত। সুতরাং গীতা রচনার কালও খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক।

৮ ।। বহিরঙ্গনে গীতার ভাষা মূল মহাভারতের ভাষার মতোই ঋজু ও দৃঢ়। অধিকন্তু বর্ণনাত্মক স্বল্প অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সবটাই দার্শনিক তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ বলে উচ্ছ্বাস ও অস্পষ্টতার অবকাশ কম। তবু যেসব স্থল বর্ণনাত্মক যেমন প্রথম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্য দর্শনে অর্জুনের নির্বেদ (২৬-৪৫) বা একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন (১৫-৩১) ও অর্জুনের স্তব (৩৬-৪৬)- এইসব ক্ষেত্রে শব্দ যোজনায় ভাষা ভঙ্গীতে

ছন্দে –অলংকারে একটা কাব্যিক বিস্তৃতি আছে। অলংকরণ ছাড়াও ছন্দের বৈচিত্র্যে ও দোলায় উচ্ছলতা আবেগ পাঠকের চিত্তে চমক সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য যে, দর্শনের পারিভাষিণ শব্দ ও অনুরূপ চিত্রকল্প সমূহ ভাষার গতিকে কোথাও মন্থর ও ব্যাহত করে না। মূল কাঠামোটি তত্ত্বনিষ্ঠ হবার ফলে কাব্যিক বিস্তৃতি ও কল্পনার আধিক্যে সীমা লঙ্ঘন করেনি। গ্রন্থে সংস্কৃত খুব সহজ না হলেও ভাষা রীতির মধ্যে জটিলতা না থাকায় পাঠে ও অর্থ অনুধাবনে সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরও খুব একটা অসুবিধা হয় না। বরঞ্চ গীতার প্রচার-বাহুল্যে এবং নিয়মিত পাঠানুশীলনের ফলে অসংস্কৃত পাঠকেরও বড় রকমের হোঁচট খেতে হয় না। মানেটা মোটামুটি অধিগত হয়। অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের মতো গীতার ভাষাতেও কিছু আর্ষ প্রয়োগ আছে তবে পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ পাঠকের নজরে তা আসে না।

৯।। গীতা গ্রন্থে খুব ছন্দ বৈচিত্র্য নেই। অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীত পূর্বা মোট এই পাঁচটি ছন্দেই গীতার সাত শত শ্লোক রচিত। তার অনুপাতিক হিসাব এই রকমঃ অনুষ্টুপ্-৬৫৫, ইন্দ্রবজ্রা-১০, উপেন্দ্র বজ্রা-৪, উপজাতি-২৭, বিপরীত পূর্বা-৪। বৈদিক সাহিত্যে বেদাঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা, কল্প, নিযুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গে পারদর্শিতা না থাকলে বেদ পাঠ, বেদার্থ জ্ঞান ও বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না। উত্তর কালে সংস্কৃত সাহিত্যে বেদাঙ্গের সবগুলি শাখার গুরুত্ব না থাকলেও ব্যাকরণ ও ছন্দ এ দুটির প্রতিপত্তি হ্রাস পায়নি। বৈদিক মন্ত্র পাঠকালে নির্ভুল ছন্দ এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত নির্ভুল উচ্চারণ না হলে-অভীষ্ট বা অনুকূল ফল তো দূরের কথা, প্রতিকূল ফলোৎপাদন করে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ ছন্দে পাঠ নির্ভুল না হলে কেবল কাব্য সরস্বতীর অঙ্গহানি হয় না, যথার্থ অর্থবোধের, কাজেই রসসৃষ্টিরও ব্যাঘাত হয়।

যাহোক গীতা গ্রন্থে অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক সংখ্যা সর্বাধিক-৬৫৫, অর্থাৎ প্রায় ৯০ শতাংশ। কিন্তু কেবল গীতাতেই নয়, রামায়ণ-মহাভারতাদি লৌকিক যাবতীয় গ্রন্থেই অনুষ্টুপ ছন্দের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার। বাংলাতে যেমন পয়ার ছন্দ, সংস্কৃতে তেমনি অনুষ্টুপ। যাহোক শুদ্ধ পাঠ ও অর্থবোধের জন্য গীতার ব্যবহৃত ছন্দ পাঁচটির একটু পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

সংস্কৃত অক্ষর বৃত্ত ছন্দে লঘু ও গুরু দুই রকমের অক্ষর বা বর্ণ আছে। অ,ই,উ,ঋ,৯ এই পাঁচটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি – সব লঘু। আর আ,ঈ,ঊ,

ৠ (দীর্ঘ ঋ), ঌ (দীর্ঘ ঌ), এ, ঐ, ও, ঔ, ং(অনুস্বার), ঃ(বিসর্গ) দীর্ঘ বা গুরু। আর চরণের অন্ত্য বর্ণটি বিকল্পে গুরু হয় এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অক্ষরটিও গুরু। এই সাধারণ বিধি।

অনুষ্টুপ ছন্দের প্রতিচরণে অক্ষর সংখ্যা আট অর্থাৎ সাকুল্যে প্রতি শ্লোকে চারটি চরণে অক্ষর সংখ্যা (৮ x ৪=) ৩২। প্রতি চরণে পঞ্চম বর্ণ লঘু আর ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হবে, আর হবে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু। প্রতি চরণে অষ্টম বর্ণে যতি। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অর্দ্ধ যতি। দ্বিতীয় চরণে যতি ও চতুর্থ চরণে পূর্ণ যতি।

ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বিপরীত পূর্বা – সব ছন্দগুলিরই প্রতি চরণে এগারটি করে অক্ষর অর্থাৎ সম্পূর্ণ শ্লোকে চার চরণে সাকুল্যে (১১x৪=) ৪৪টি অক্ষর। মূল ছন্দ ইন্দ্র বজ্রা। আর তারই নানারকম ফেরে আর তিনটি ছন্দের উদ্ভব। ইন্দ্র বজ্রা ছন্দের প্রতি চরণে তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ লঘু, বাকিগুলি গুরু। প্রতি চরণে অর্দ্ধ যতি পড়ে ষষ্ঠ বর্ণে আর যতি একাদশ বর্ণে। ইন্দ্র বজ্রা ছন্দে রচিত শ্লোক – ২/৭, ২৯; ৮/২৮; ৯/২০; ১১/২০, ২২, ২৭, ৩০; ১৫/৫, ১৫- মোট ১০টি।

ইন্দ্র বজ্রার প্রতি চরণের প্রথম অক্ষরটি লঘু হলে তাকে বলে উপেন্দ্র বজ্রা ছন্দ। যতি পদ্ধতি ইন্দ্র বজ্রার মতো। ১১/১৮, ২৮, ২৯, ৪৫ – এই চারটি উপেন্দ্র বজ্রা।

উপজাতি ছন্দ হয় ইন্দ্র বজ্রা ও উপেন্দ্র বজ্রা দুটির মিলনে। চারটি চরণের মধ্যে একটি, দুটি বা তিনটি চরণ ইন্দ্র বজ্রা এবং অপর একটি উপেন্দ্র বজ্রা হলে অথবা একটি, দুটি, তিনটি উপেন্দ্র বজ্রা এবং অপরটি ইন্দ্র বজ্রা হলে – সেই ছন্দের নাম উপজাতি। যতি একই রকম। গীতাতে উপজাতি ছন্দের শ্লোকই বেশি – ২৭ টি। ২/৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০; ৮/৩, ১০, ১১; ৯/২১; ১১/১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০; ১৫/২, ৩,৪।

বিপরীত পূর্বা আসলে উপজাতিরই একটি প্রশাখা। প্রথম চরণটি ইন্দ্র বজ্রা এবং পরের তিনটি চরণ উপেন্দ্র বজ্রা হলে – তাকে বলে বিপরীত পূর্বা। চারটি শ্লোক আছে বিপরীত পূর্বা ছন্দে। ১১/৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪।

১০।। গীতার প্রসিদ্ধি বা মূল্য তথা একমাত্র পরিচয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র বা তত্ব গ্রন্থ হিসেবে। তার সাহিত্যিক দিকটা তলিয়ে দেখবার কথা মনে আসে না।

অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার সাহিত্যিক আবেদনও নগণ্য নয়। বহু স্থানেই অনুপ্রাসের মাধুর্য আছে যেমন "তত্রা পশ্যাৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতা মহান্ (১/২৬)" "শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি"(১/২৬), বা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞা বাদাংশ্চ ভাসসে। গতাসূন গতাসুংশ্চ নানুশোচতি পণ্ডিতাঃ।। (২/১১) ইত্যাদি শব্দালংকার ছেড়ে দিলেও বহু অর্থালংকার আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলনামূলক উপমা বর্গের উপমা, প্রতীক, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রমুখ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

১।। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনাণি
সংযাতি নবাণি দেহী।। ২/২২

২।। ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।। ৩/৩৮

৩।। সর্বং জ্ঞান প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যতি।। ৪/৩৬

৪।। যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। ৪/৩৭

৫।। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।। ৬/৩৪

৬।। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭/৭

৭।। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৯/৬

৮।। দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১১/১২

৯।। যথা নদীনাং বহবোঽম্বু বেগাঃ।
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা।
বিশন্তি বক্তাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।১১/২৮

১০।। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।১১/২৯

..... ইত্যাদি আরো বহু কাব্য গুণ সমৃদ্ধ অলংকার আছে। তা চোখে পড়ে না কিন্তু অলক্ষ্যে পাঠক চিত্তে প্রসন্নতা সৃষ্টি করে।

এবার সাহিত্য রসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। প্রথম অধ্যায়ের শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনজনদের দেখে অর্জুনের যে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছিল, আসন্ন শোকের যে ঘন-মেঘচ্ছায়া ব্যাকুল করেছিল সব্যসাচীর মন, তার অপূর্ব চিত্র আছে ২৬ থেকে ৪৫ শ্লোকের মধ্যে। অদূর ভবিষ্যতে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় করুণ আর্তির সুরটি ত্যক্ত গান্ডীব শোকসংবিগ্ন মানস অর্জুনের অসহায় বেদনাকে ছাপিয়ে যেন পাঠক চিত্তেও সঞ্চারিত হয়। জীবনের কঠিনতম নিশ্চিত সত্য মৃত্যুর মুখোমুখি যেন দাঁড়িয়ে পড়ি আমরা সবাই।

আবার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্ময় বিহ্বল, হত চকিত অর্জুনের ভীত ভীতঃ সগদগদ উক্তি, স্তব, বিনয় ও সহস্র বাহুকে চতুর্ভূজ হবার ব্যাকুল প্রার্থনা- একটি অদ্ভুত রসের অজ্ঞাত বিস্ময়কর পরিমণ্ডলে টেনে নিয়ে যায়, বিরাটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সার্থক কাব্য সঞ্চারণ ধর্মী, পাঠক হৃদয়ে বাক্যের মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবকে সঞ্চারিত করে দিয়ে রসাস্বাদন করায়। এই প্রসঙ্গে ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্তে সঞ্জয় বাক্যটি স্মরণীয়। ব্যাস প্রসাদে বাসুদেব অর্জুন সংলাপে যে অদ্ভুত লোমহর্ষক কথা শুনেছেন সঞ্জয়, তা স্মরণ করে মুহুর্মুহু আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন তিনি, ভগবানের যে অদ্ভুত রূপ দর্শন করেছেন, তা স্মরণ করে বারবার শিহরিত হচ্ছেন। একটি পরম সত্য তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছে, তিনি বুঝেছেন যে, যেখানে একত্রে অবস্থান করেন যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ- সেখানেই আছে শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি জীবনের পরম সার্থকতা।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।৭৮

একটি অদ্ভুত রসযুক্ত শান্ত রসের বিস্ময়কর উপলব্ধির মহাকাশে যেন উন্নীত হই আমরা। এর কাব্য সমৃদ্ধি প্রশ্নাতীত।

বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কালের বাংলার অন্যতম সাধক হচ্ছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি দীর্ঘদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

ব্রাহ্মধর্মে থেকেও মনে পূর্ণভাবে শান্তি পাচ্ছিলেন না বিজয়কৃষ্ণ। অন্তরে জ্বলছিল দারুণ আধ্যাত্মিক পিপাসা। তাই বহিরঙ্গপূর্ণ এবং অনুষ্ঠানসর্বস্ব নিষ্প্রাণ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তিনি হয়েছিলেন বীতশ্রদ্ধ এবং সমালোচনামুখর। তারপর উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে তিনি মনে প্রাণে শক্তিলাভ করেন। কালে তিনি হয়ে উঠলেন দেশবরেণ্য মহাতাপস।

যেমন অন্য সব সাধকদের জীবনে ঘটে থাকে তেমনি সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনে অনেকবার অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। দেহরক্ষার পরও তিনি একাধিকবার দেখা দিয়েছেন তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য-শিষ্যাদের। এই প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের প্রশিষ্য এবং দরবেশজীর শিষ্য সদানন্দ লিখেছেনঃ

'...দরবেশজী পুরী যাইবার পথে চুনাপুকুরে আসিয়াছেন। ...ডাঃ সুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশালের ডাঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ বদ্রী, শ্রী অনাথবন্ধু রায়, ডাঃ নিরোদবরণ বর্মণ প্রভৃতি বহু ব্যক্তির সাধন চুনাপুকুরে একই দিনে হইল। দরবেশজী প্রভাত দাদাকে এইদিন কোথাও যাইতে নিষেধ করিলেন। এই দিনের সাধনে কি হইবে ইহা যেন তাঁহার জানা ছিল। বেলা নয়টা। সাধন দেওয়ার ঘরখানি সাধনপ্রার্থী এবং দরবেশজীর শিষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ। ঘরে স্থান না পাইয়া আমরা অনেকেই বাহিরে বসিয়াছি। ঘরের ভিতর সাধন হইতেছে। রুদ্ধ দরজা। আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। নাম প্রদানের পর প্রাণায়াম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল ক্রন্দন, চীৎকার এবং একটা হৈ হৈ শব্দ। সাধন প্রার্থীরা উচ্চস্বরে যতই না চিৎকার এবং ক্রন্দন করিতেছেন, দরবেশজীর উচ্চ কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ তাঁহাদের চীৎকার এবং ক্রন্দনের স্বরকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর উচ্চস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। চীৎকার প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। জনতার ভীড় দেখিয়া জনৈক পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। প্রভাত দাদা সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া বলায় সে ভীড় সরাইয়া দিল।

'সাধন ঘরের দরজা খোলা হইল। সেদিনকার সাধনে কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না। ডাঃ হেমেন্দ্র প্রসাদ বদ্রী প্রভৃতিকে ধরিয়া নীচে আনা হইল। মনে

হইল, আজ যেন দরবেশজী তাঁহার চিহ্নিত দুই চারজনকে দীক্ষা দিলেন। রাত্রে দরবেশজীকে অদ্যকার এই সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ গোঁসাইজী নিজে সাধন সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ নিরোদবরণ বর্মন সাধন দেওয়ার সময় দরবেশজীর পার্শ্বে গোঁসাইজীকে দর্শন করেন।'

চুনাপুকুরে অবস্থান করছেন দরবেশজী। তাঁর শিষ্য সুধন্যকুমার ঘোষের মেয়ে খুকী দেখতে এলো দরবেশজীকে।

সেদিন অনেক রাত হয়েছে বলে খুকীর আর বাসায় ফেরা হলো না। রাতে সে চুনাপুকুরেই থেকে গেল।

ঘরের ভেতর অনেকেই রয়েছে। খুকী কি কারণে দরজা খুলে বেরুতেই দেখতে পেল বিরাট কলেবর বিশিষ্ট জটাজুটধারী আবক্ষ শ্মশ্রুবিশিষ্ট গোঁসাইজী সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন।

খুকী এর আগেই গোঁসাইজীর ফটো দেখেছে। এবার তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করে ভয়ে অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিলো। তার পরদিন থেকে খুকীর মাথার গোলমাল দেখা দিলো। কখনো কান্না কখনো প্রলাপ আবার কখনো হাসতে লাগল।

ওর ঐ অবস্থা লক্ষ্য করে গোঁসাইজীর শিষ্যদের দুশ্চিন্তার আর শেষ রইলো না। কেননা সে বিবাহিত মেয়ে। যদি মাথা খারাপ হয় তো স্বামীর ঘর একেবারে ঘুচে যাবে।

ঘটনাটির কথা বিকেলের দিকে দরবেশজীকে জানানো হলো। তিনি সব শুনে বললেন, খুকীর মাথা খারাপ হয়েছে আমি তার কি করবো? আমি কোন জাদু জানি না।

খুকীর মা কাতরভাবে দরবেশজীকে বললেন, বাবা, সবই বুঝলুম, কিন্তু মেয়েকে স্বামী যে আর নেবে না। শেষ পর্যন্ত বুড়ো বয়সে এই মেয়ের খেদমত আমাকেই করতে হবে?

দরবেশজী শুনে বললেন, খুকীকে নিয়ে এসো, দেখি ওর কি হয়েছে। খুকীকে আনা হলো দরবেশজীর কাছে।

দরবেশজী বললেন, খুকী তোমার কি হয়েছে? এরূপ করছো কেন? খুকী থেকে থেকে কখনো হাসতে লাগল, কখনো কাঁদতে লাগলো। দরবেশজী গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, আমার চোখের দিকে তাকাও দেখি। খুকী পাগলের মত দরবেশজীর সামনে আরতির ভঙ্গীতে নাচতে লাগলো। দরবেশজী তার পিঠে

হাত দিয়ে বললেন, মা তুমি ভাল হও, শান্ত হও, স্থির হও। খুকী চুপ করে রইলো। সেইদিনই সে বাসায় চলে গেল। দরবেশজী রাতে বললেন, কাকে তিনি কোন্ অবস্থায় দেখা দেন সেটা কেউ বলতে পারে না। খুকীর ভাগ্যে গোঁসাইজীর দর্শন ছিল তাই ঘটলো। ও সহ্য করতে পারেনি, আর পারবেই বা কেমন করে? যারা সাধন পেয়েছে কত সময় তারাই ভয় পায়। আর ও তো অসাধনের। এর দিন কতক পরে খুকী ভাল হয়ে গেল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ভূমিকম্পের কিছুদিন পর দরবেশজী এলেন চুনাপুকুরে। একদিন দুপুরে তিনি জনৈক শিষ্যের কাছে তাঁর গুরুজী বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিক লীলাকাহিনী বলতে লাগলেন। মজঃফরপুর থেকে আমার এক গুরু ভাইয়ের চিঠি পেলুম। ভূমিকম্পের সময় গোঁসাই কি করে তাঁর জীবন রক্ষা করলেন বিস্তারিত ভাবে লিখছেন- দুপুরের সময় দোতলার ঘরে বসে আছি। ছেলেরা বাইরে গেছে। স্ত্রী মাদুর পেতে শুয়ে আছেন। হঠাৎ ঘরখানি দুলতে লাগলো। দুজনে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। চারদিকে হুড়মুড় করে বাড়ীগুলি পড়ে যাচ্ছে। ঘরের ভিতর গোঁসাইজীর আসন। ভাবলুম জীবনের আর কোনই আশা নেই। আমার বাড়ীর সামনের দিকটা তাসের ঘরের মত মাটিতে পড়ে গেল। এবার যে দিকটায় আমি রয়েছি এমনভাবে কাঁপতে লাগলো মনে হল এই বুঝি সব ভেঙ্গে পড়ল। আমি 'গোঁসাই' 'গোঁসাই' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। এমনি সময় দেখি তীব্র জ্যোতি গোঁসাইজীর ফটোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আর দেখলুম তিনি হাতখানি উঁচু করে আমাদের অভয় দিচ্ছেন। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। জ্ঞান হতে দেখলুম, এত বড় বাড়ীটার ভেতরে এই ঘরটি আর এর নীচের তলার ঘরখানি কেবল আছে। গোঁসাইজীর কি অপূর্ব দয়া।

চুনাপুকুরে রয়েছেন দরবেশজী।। একদিন তাঁর ওপর গোঁসাইজীর কৃপার কথা বললেন তাঁর জনৈক শিষ্যকে, বরিশালে 'চ্যাটার্জি এন্ড ব্রাদার্স' নামে মস্ত বড় ব্যবসা চলছে। গোঁসাইজী দেহ রেখেছেন। চারদিক থেকে অর্থ আসছে। কোনদিকেই কোন কিছুর অপ্রাচুর্য্য নেই। একদিন দুপুরে অফিস ঘরে চেয়ারে বসে অফিসের কাজকর্ম দেখছি। ঘরের ভেতর আর কেউ নেই। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি- সামনে গোঁসাইজী দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন – 'আর কেন, এইবার চলে এস।' আমি সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে অজ্ঞান হলুম। যখন আমার জ্ঞান হলো দেখলুম- ঘামে আমার সর্বাঙ্গ এমন কি পরবার ধুতি খানা পর্যন্ত ভিজে গেছে। গোঁসাইজী অন্তর্ধান হয়েছেন। তারপর দিনই বরিশালের

বিখ্যাত 'চ্যাটার্জী এন্ড ব্রাদার্স' নামমাত্র কয়েক হাজার টাকায় বিক্রি করে তীর্থ পর্যটনে বের হলুম।

বিডন স্কোয়ারে ডা; নীরোদবরণ বর্মনের বাড়ীতে অবস্থান করছেন দরবেশজী। একদিন রাতে ঐ বাড়ীতেই সেতার বাজিয়ে ভজন আরম্ভ করলেন তিনি। ভক্ত কেদারনাথ এবং দরবেশজীর আরও কয়েকজন শিষ্য তন্ময় চিত্তে শুনছেন ঐ সুমধুর ভজন গান।

ঝঙ্কারের মূর্ছনায় মূর্ছনায় ভাব লোটাচ্ছে। দরবেশজী সমাধি মগ্ন। হঠাৎ ভাবাবেশে সেতারের তার থেকে তাঁর করাঙ্গুলি সরে গেল। কিন্তু বিরাম হলো না সেতারের ঝঙ্কারের। সে সমান ভাবেই বেজে চলেছে। পরদিন সকাল বেলায় দরবেশজী তাঁর প্রিয় ভক্তদের সামনে বললেন, তাঁর গুরুদেব গোঁসাইজীর অলৌকিক লীলাকথা। তিনি বললেন, কাল যখন আমি সেতারে ভজন গান গাইছিলাম তখন সে ভজন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন গোঁসাইজী।

শিষ্যের ওপর গুরুর কৃপা সকল সময়ই থাকে। আর এই কৃপার এমনই মাহাত্ম্য যে তার শক্তিতে শিষ্যের জীবনে অনেক অঘটন ঘটে যায়। দরবেশজীর গুরু বিজয়কৃষ্ণ। গুরুর কৃপাশক্তি লাভ করে দরবেশজী কন্টকাকীর্ণ সংসার অরণ্যে নির্বিঘ্নে বিচরণ করার শক্তি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে একদিন দরবেশজী কথোপকথনের সময় তাঁর শিষ্যদের কাছে বললেন এক কাহিনী। সেটি নিম্নরূপঃ

'বাংলা ১৩০২ সালের মাঘ মাস। গোঁসাইজী তখন ঢাকায়। তিনি আমাকে গুরু ভ্রাতা মাসমের ভগ্নী তোমাদের মাঠাকুরাণীকে বিবাহ করতে নির্দ্দেশ দিলেন। এই মাসেই মাসমের বাড়ী আড়িয়াল এসে তোমাদের মা'কে গোঁসাইজীর নির্দ্দেশের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "তাঁর যখন নির্দ্দেশ হয়েছে, আমিও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।"

পর বৎসরের ২০ শে আষাঢ়, বুধবার, গোঁসাইজীর নির্দ্দেশমত রাত্রি ছয় দণ্ডের পর আমাদের বিবাহ হল। খালিয়ায় তোমাদের মা'কে নিয়ে এলাম। বাড়ীতে সেকি উৎসব! তোমাদের মা বললেন, এত আনন্দের মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।' আমি বললাম, "এই আনন্দ উৎসব তোমার জীবনের যেন শেষদিন পর্য্যন্ত থাকে।"

'বিবাহিত জীবন কিভাবে আমাদের কাটাতে হবে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল। আমরা ঠিক করে নিলাম, আমাদের ধর্ম সাধনার পথে কেউ কাউকে বাধা দেবে না এবং তার জন্যে যে কোন দুঃখ কষ্টই আসুক না কেন হাসিমুখে মাথা পেতে নেব। ঠাকুরের (গোঁসাইজীর) আদেশ অক্ষরে অক্ষরে

পালন করব। তোমাদের মা বললেন, "দেখ, আমি তোমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিনী, তোমার ধর্ম্মলাভের পথে আমাকে সহায় হতে হবে।"

আমি বললাম, "তোমার ধর্ম্মলাভের পথে আমার তপস্যাও তোমাকে সাহায্য করবে।"

'একই শয্যায় শুয়ে সংযত ভাবে; ইন্দ্রিয় প্রভাব মুক্ত হয়ে থাকতে পারি কিনা এই পরীক্ষা আরম্ভ হল। দেখলাম এ পরীক্ষায় আমরা জয়ী হয়েছি। গোঁসাইজীর পত্র পেলাম, তিনি লিখেছেন, 'আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এ পরীক্ষায় পাশ হলে, আর ভয় নেই।' কামকে তখনও জয় করতে পারিনি। কিন্তু গোঁসাইর অপূর্ব কৃপায় কামের ওপর আমাদের এক বীতরাগ এসে গেল। আমরা বাইরে গৃহী থাকলেও ভিতরে এক প্রকার সন্ন্যাসী জীবনই যাপন করতে লাগলাম।'

এমনি অলৌকিক শক্তি ধরে গুরুকৃপা।

গুরুর কৃপাশক্তিতে শিষ্যের জীবনে অনেক জটিল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গুরু সমস্যা লঘু হয়ে যায়। অজানাকে জানা যায়, অপ্রাপ্তকে পাওয়া যায়। এককালে গোঁসাইজীর জন্মোৎসবের সময় কোলকাতায় উপযুক্ত স্থানাভাব হওয়ায় মহা সমস্যার সৃষ্টি হলো। গোঁসাইজীর শিষ্যগণ প্রমাদ গুনলেন। পরে তাঁর কৃপায় অকস্মাৎ এবং অভাবিত উপায়ে কোলকাতার খুব নামী ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে দরবেশজীর শিষ্য সদানন্দ লিখেছেনঃ

'কাশীতে বেরিবেরির প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃই উহা মহামারীর আকার ধারণ করিল। দরবেশজীর শিষ্যদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে এই সময় তিনি কাশীতে যান। অথচ গোঁসাইজীর জন্মোৎসব সন্মুখে। দরবেশজী বনমালী সরকার স্ট্রীটে গুরু ভ্রাতা শ্রী শৈলেশ চন্দ্র গুহের বাড়ীতেই আছেন। চারিদিক হইতে অনুরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাশী হইতে আশ্রম পরিচালক স্বামী গোবিন্দানন্দও পত্র যোগে দরবেশজীকে কাশীতে যাইতে নিষেধ করিলেন। দরবেশজী একদিন আমাদের হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলেই যখন উঠে পড়ে লেগে গেছ তখন আর কাশীতে যাই কি করে। তবে আমি এখানে থাকব না। আমার এই গঙ্গার পারে ছোট এক খানি বাড়ী দেখ।" আমরা বাড়ীর তল্লাসে ছুটিলাম। উপযুক্ত বাড়ী সহজে কোনদিনই জোটে না। আমাদেরও দেরী হইতে লাগিল। সময় আর বেশী নাই। এদিকে বাড়ীও জুটিতেছে না। আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, দরবেশজী কিন্তু নির্বিকার। এমন সময় একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য শ্রদ্ধেয় কেদার নাথ মন্ডল মহাশয়ের জনৈক মাড়োয়ারী রোগী কেদার দাদার নিকট দরবেশজীর বাড়ীর প্রয়োজন

জানিতে পারিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউর উপর বিনা ভাড়ায় তাঁহার একটি বাড়ী দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। দরবেশজী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আমরা তৎপরদিবসেই উক্ত বাড়ীটি দেখতে গেলাম। সে এক বিরাট বাড়ী। গোঁসাইজীর জন্মোৎসবের স্থান জুটিয়া গেল। দরবেশজী বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া বলিলেন সবই তাঁর দয়া।"

গোঁসাইজীর জীবনে অনেক অলৌকিক লীলা দেখা গেছে। তিনি নিজে যেমন অলৌকিক লীলার অধিকারী ছিলেন তেমনি তাঁর জীবনে বাইরে থেকে অলৌকিক লীলার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই প্রসঙ্গে একদিন তাঁর শিষ্য দরবেশজী তাঁর ভক্ত ও অনুগামীদের উদ্দেশ্যে যে অপূর্ব কাহিনী বলেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

'বৃন্দাবনে আমার তখন কেবলমাত্র সাধন হইয়াছে। সকালবেলা দিদিমা এসে গোঁসাইজীকে বললেন, 'আজ আর ভাঁড়ারে কিছু নেই। কি দিয়েই বা ভোগ হবে, আর কি করেই বা এত লোকজন খাবে।' গোঁসাইজী নির্বিকার। দিদিমা আর একবার বলতেই তিনি বললেন, 'আমরা অতি ভাগ্যবান। যিনি সবার আহার জোগান, আজ তিনি আমাদের আহার জোগাবেন। আমরা তাহলে তাঁর বিশেষ দৃষ্টির ভিতরেই পড়েছি। তোমরা সব কীর্ত্তন কর।' আমরা কোমর বেঁধে কীর্ত্তন শুরু করলাম। বেলা প্রায় নয়টা, এমন সময় দেখলাম ভাঁড়ে ভাঁড়ে চাল, ডাল, মসলা, আটা, ঘি, কাঠ প্রভৃতি এসে হাজির হল। গোঁসাইজী শুধু জিজ্ঞাসা করলেন-কে পাঠাল? জানা গেল, কোন এক ব্যবসায়ী সাধুর ভান্ডারা দিয়েছেন, তিনিই পাঠিয়েছেন। এমনই ছিল তাঁর নির্ভরতা। আকাশ-বৃত্তি বলতে যা বোঝায় তাই ছিল তাঁর অবলম্বন।

অলৌকিক লীলাময় বিজয়কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে অনেক অসাধ্যসাধন ঘটিয়েছেন। অনেক দৃষ্টিহীন মানুষ ফিরে পেয়েছেন তাঁদের দৃষ্টি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিধু নামে এক মহিলা।

বিধুকে দরবেশজী প্রভাতবাবুর বাসায় রেখে যান। প্রভাতবাবুর স্ত্রী পারুল নিজের মায়ের মত অন্ধ বিধু দিদির সেবা করতে লাগলেন। ডাক্তার শিষ্যরা সর্বদাই তাঁর তত্ত্বাবধান করতে আসেন। চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুকুমার বাগচিকে আনা হলো। নানারকম চিকিৎসা হলো। কোন ফলই হলো না। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো- অপারেশন করতে হবে। ডাক্তারেরা বললেন, অপারেশন ভাল হবার আশা খুবই কম, তবে অপারেশনই শেষ চেষ্টা।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগ। অল্প অল্প শীত পড়েছে। বিধু একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঠাকুর ঘরে শুয়ে আছেন। পরদিন সকালবেলা অপারেশন হবে। তিনি সন্ধ্যার সময় হতেই কাঁদতে আরম্ভ করেন। যত রাত বাড়তে লাগলো তাঁর কান্নাও তত বাড়তে লাগলো।

গোঁসাইজী ও ঠাকুরের নাম করে তাঁর আকুল কান্না শুনে বাসার সকলেরই চোখে জল এলো। প্রত্যেকেরই মন ভারাক্রান্ত হলো। বিধু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত প্রায় চারটে। প্রভাতবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন, বিধু ইলেক্ট্রিক আলো জ্বেলে বসে আছেন। অন্ধ বিধু আলোর সুইচ কোথায় জানতেন না। প্রভাতবাবু তাকে বললেন, আপনি চোখে দেখেন না, আলো জ্বালাতে গেলেন কেন? যদি আপনার হাতে শক লাগতো? বিধু বললেন, আমি চোখে দেখছি।

বিধুর ঐ কথা শুনে বিস্মিত হলেন প্রভাতবাবু। তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখলেন, সত্যিই বিধু চোখে দেখছেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর প্রভাতবাবু বিধুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কিভাবে আপনার দৃষ্টি ফিরে পেলেন? বিধু বললেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লুম। স্বপ্নে দেখলুম গোঁসাইজী ও ঠাকুর (দরবেশজী) খড়ম পায়ে আমার কাছে এলেন। গোঁসাইজী আগে- ঠাকুর পেছনে। দুজনেই আমার কাছে বসলেন। ঠাকুর গোঁসাইজীর কাছে হাত জোড় করে বললেন- 'আপনি বিধুর চোখ ভাল করে দিন।'

গোঁসাইজী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'ব্যস্ত হয়েছ কেন? হবে খন।'

কিছুক্ষণ পর দুজনেই চলে যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন- গোঁসাইজী তাঁর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আমার চোখের ওপর আঘাত করলেন। আমি ভয়ে আর ব্যথায় চীৎকার করে উঠলুম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি-আমি চোখে দেখছি।'

এমনি ধারা অলৌকিক লীলা প্রকাশ পেয়েছে গোঁসাইজীর তাঁর আশ্রিত জনকে কেন্দ্র করে।

মানুষের মত **সুনন্দন ঘোষ**

রক্তের স্রোত বইছে ইরাকে, সিরিয়ায়, ইউক্রেনে, আফগানিস্থানে।
বইছে আমার দেশেও।
গুজরাটে বিলকিস বানোকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল ধ্বজাধারীরা।
কাশ্মীরে গিরিজা টিক্কুর শরীরকে দু টুকরো করেছিল জিহাদের করাত।
কিয়েভে ওক্সানা শ্বেটসকে মুছে দিল সমাজবাদী ক্ষেপণাস্ত্র।
বীরভূমের বকটুইয়ে দগ্ধে মরল যারা
তাদের নামগুলোও জ্বলে গেল শরীরের সাথে।

পঁচাত্তর বছর আগে পূবে বাংলা পশ্চিমে পাঞ্জাব ভেসে গেছিল
শয়তানদের পাশা খেলায় বনবাসী হওয়া
কোটী মানুষের রক্তে কান্নায়।
বত্রিশ বছর আগে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে ধর্মহীন শয়তানরা
লক্ষ লক্ষ প্রতিরোধকারীকে পাঠিয়েছিল ত্রাণ শিবিরে আর গণ কবরে।
নিয়তির একই সূতোয় বাঁধা প্যালেস্টাইন, রেঙ্গুন, কলকাতা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কত হাজার বছর কেটে গেল!
মানুষ মানুষের মত বাঁচতে শিখল না, মরতেও শিখল না।

DO NOT COPY